بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১৩ জানুয়ারী ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৩ জানুয়ারী ২০১২-এর (১৩ সুলাহ্, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِك يَوْمِ الدِّين * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ* وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ*

এগুলো সূরা হূদের ৩ ও ৪ নাম্বার আয়াত। এর অনুবাদ হলো, **'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে তাঁর পক্ষ থেকে একজন সর্তককারী এবং শুভসংবাদ দাতা। এবং (আরো বলা হয়েছে) তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো (এবং) এরপর তাঁর কাছে সবিনয়ে তওবা করো। তাহলে তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন এবং প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে তার (যথাযথ) মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে নিশ্চয় আমি তোমাদের বিষয়ে এক ভয়ংকর দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি'।**

আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কোন না কোনভাবে বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে। আর এর কারণ হচ্ছে, মানুষ জন্মের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি মনোযোগ, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে ভুলে গেছে; আর ইবাদত ছাড়া আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন সম্ভব নয়। ইবাদত কী? কেবল পাঁচবেলা নামায পড়াই ইবাদত নয়। নামাযগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে পড়তে হবে। আবার কেবল বাহ্যিকভাবে সুন্দর করে নামায পড়লেই হবে না বরং নিজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সত্তাকে সামনে রাখা আবশ্যক। আল্লাহ্র রঙ্গে রঙ্গীন হবার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেকটি বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর আদর্শকে অনুসরণ করার চেষ্টা করা আবশ্যক। আল্লাহ্র গুণাবলী-সমূহকে দৃষ্টিতে রেখে তদনুসারে নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্র প্রাপ্য আল্লাহ্কে দেয়ার এবং মানুষের পাওনা মানুষকে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

যখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে তখনই একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে ইবাদতকারী হতে পারে, মু'মিন হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন,

'সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে একটি আশ্চর্যজনক কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ (কুরআনে) এতো যে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এর সারাংশ এবং সার কথা কি'? অর্থাৎ বহু তফসীর করা হয়েছে, বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনে যে আদেশ-নিষেধ রয়েছে সেগুলোর সারমর্ম ও গুঢ়তত্ত্ব কি? তিনি (আ.) বলেন, 'أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ **অর্থাৎ কখনোই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না** (সূরা হূদ:৩)। **আসল কথা হলো, মানব জন্মের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইবাদত'।** অর্থাৎ এটিই সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য। **'যেমন অন্য একস্থানে বলা হয়েছে,** وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (অর্থাৎ 'আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি' সূরা আয্ যারিয়াত:৫৭)। **ইবাদত আসলে এটিকে বলা হয়, সকল প্রকার কঠোরতা (স্থূলতা) ও বক্রতাকে দূর করে মানুষের হৃদয়-জমিকে এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা উচিত যেভাবে কৃষক তার জমিকে পরিষ্কার করে।** (বীজ বপনের পূর্বে) **আরবরা বলে 'মওরুম্ মুয়াব্বাদুন' যেভাবে সুরমাকে পিষে মিহি করে চোখে লাগানোর উপযুক্ত করা হয় তেমনি অন্তরের জমিতে যেন কোন নুড়ি পাথর ও কঙ্কর না থাকে, অসমতলতা না থাকে। এমন পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত যেন তা কেবলই আত্মাসর্বস্ব হয় অন্য কিছু যেন না থাকে; তখন এর নাম ইবাদত। যদি কোন আয়নাকে এভাবে ঠিক করা হয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় তাহলে তাতে স্বীয় আকৃতি দেখা যাবে। এবং যদি জমিকে এভাবে পরিষ্কার করা হয় তাহলে তাতে বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। অতএব মানুষ যাকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি সে নিজ অন্তর পরিষ্কার করে এবং এতে কোনরূপ বক্রতা বা অসমতা না থাকে, নুড়ি বা পাথর না থাকতে দেয়া হয় তাহলে তাতে খোদা দৃশ্যমান হবেন'।**

অতএব নিজের সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে করার নামই ইবাদত, যেভাবে একজন কৃষক বীজ বপনের পূর্বে জমিকে মসৃন করে থাকে। আপন হৃদয়কে সেভাবে দৃত্যিময় করো যেভাবে একটি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ আয়না চকচক করে এবং যাতে চেহারা পরিস্কারভাবে দেখা যায়। এমন অবস্থা হলে তখন ভালভাবে প্রস্তুতকৃত কৃষকের জমিতে যেভাবে ভাল ফসল উৎপন্ন হয় সেভাবে মানব হৃদয়ে আর মানুষের আত্মায় ভাল ফসল ফলবে।

হুযূর (আ.) আরো বলেন, **'হৃদয়-জমিনে আল্লাহ্ ভিন্ন যত কঙ্কর ও পাথর আছে যতদিন তা দূর করা না হবে এবং একে আয়নার মত স্বচ্ছ ও সুরমার মত মিহি না করবে এবং ততদিন ক্ষান্ত হবে না'।** কাজেই চেষ্টা অব্যাহত রাখ, আর নিজের ভেতর এমন পরিবর্তন না আনা পর্যন্ত একজন মু'মিনকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা উচিত নয়।

অতএব চলমান বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য থেকে মুক্ত থাকা এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আল্লাহ্‌র সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক গড়া উচিত। অধিকাংশ সময় এমনও হয়, একজন মানুষ সরাসরি কোন বিশৃঙ্খলা বা অনিষ্টে জড়িত না থাকলেও পারিপার্শ্বিকতার কারণে সেই অনিষ্ট বা নৈরাজ্য তার উপরও প্রভাব বিস্তার করে এবং সে এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। কোন না কোন ভাবে এতে জড়িয়ে পড়ে। এ কারণে সে শুধু অন্যের অধিকারই খর্ব করে না বরং অজ্ঞাতসারে মানুষ অন্যায়ও করে বসে। বর্তমানে আহমদীদের সাথে বিভিন্ন দেশে যা হচ্ছে তা এর একটি বাস্তব উদাহরণ। অনেকে আহমদীয়াত সম্পর্কে না জানা সত্ত্বেও আহমদীয়াতের বিরোধীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় আইনের জন্য পাকিস্তানের অসংখ্য স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা ব্যবহার করা। লিখিত (সরকারী নথিপত্রে) অশালীন বাক্যের

সমর্থনে তারা দস্তখত করে। অতএব এভাবেই অজ্ঞাতসারে মানুষের ইবাদত আল্লাহ্ তা'লার পরিবর্তে সেই সকল দুনিয়ার কীটদের নৈকট্য লাভের জন্য হয়ে থাকে। বাহ্যিক ভাবে তারা নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু আন্তরিক ভাবে না হলেও অবচেতন মনে বা পরোক্ষভাবে সেসব পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের চেষ্টাহীনতা পরিলক্ষিত হয় যার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। ধর্মকে যখন পার্থিবতার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় এবং ধর্মের মাঝে যখন বিকৃতির সৃষ্টি হতে শুরু করে তখন আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকার পদদলিত হয়। ধর্মের ইতিহাসে সর্বদা এমনটিই হয়ে এসেছে, কালের প্রবাহে এক সময় এসে ধর্মের মাঝে বিকৃতি দেখা দিয়েছে। আর এ জন্যই আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন জাতিতে নবী প্রেরণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। কালের আবর্তনে ধর্ম যখন মূল থেকে দূরে সরে যায় এবং এর চেতনা লোপ পেতে থাকে তখন জাতিসমূহকে সতর্ক করতে, তাদেরকে সঠিক ধর্মে ফিরিয়ে আনতে ও প্রকৃত ইবাদত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সরাসরি দিক নির্দেশনা পেয়ে নবীগণ স্বীয় ভূমিকা পালনের জন্য আসেন। আর আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করে তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের এবং তাঁর মান্যকারীদের ইবাদতের মূল আচরণবিধি ও রীতি-নীতি শিখিয়েছেন। তিনি পরিপূর্ণ মানব ছিলেন আর এক মানবের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী যতটা বিকশিত হওয়া সম্ভব তাঁর সত্তায় তা পুরোপুরি ঘটেছে। আবার আমরা আদেশ দিয়েছি, **'এ রসূল (সা.) তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ'**। তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা আমার কাছে পৌঁছতে পারবে। ইনি এমন এক রসূল যাঁর কেবল নামায ও বিভিন্ন নফলই ইবাদত নয় বরং তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজই ইবাদত ছিল।

অতএব ইবাদতের এই মান অর্জন করুন। যদিও এখন ধর্ম এ প্রিয় নবী কর্তৃক আনীত শরিয়তের মাধ্যমে চিরতরে পরিপূর্ণরূপ লাভ করেছে কিন্তু এরপরও আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেছেন এবং মহানবী (সা.)-কে দিয়েও বলিয়েছেন, যেভাবে আদি থেকে এ রীতি চলমান, কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর ধর্ম আপন মৌলিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায় একইভাবে মুসলমানদের মাঝেও বিকৃতি এবং ধর্মের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হবে। যদিও তিনি আখেরী বা শেষ নবী এবং তাঁর পর শরিয়ত বাহক কোন নবী আসতে পারে না, তাঁর ধর্মগ্রন্থই শেষ শরিয়তবাহী ধর্মগ্রন্থ, এতদসত্ত্বেও তিনি বলেন, অবস্থা এমনই হবে যে, লোকেরা ধর্ম থেকে দূরে সরে যাবে আর এ দূরত্ব যখন চরম রূপ নিবে তখন মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিক পুনরায় ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রতিষ্ঠাকল্পে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসবেন এবং ইবাদতের প্রকৃত মর্ম উপস্থাপন করবেন। আর এ সবকিছু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হবার সুবাদে এবং তাঁর দাসত্বে তিনি লাভ করবেন। কিন্তু পরিতাপ! মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ট শ্রেণী এখনও এ বিষয়টি অনুধাবন করছে না, আর যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সঠিক ইবাদতের পানে আহ্বান করছেন তাঁর সত্তা হতে দূরে থেকে প্রত্যেক ফিরকা নিজ নিজ পথ ও পন্থার অনুসরণ করছে। যার ফলশ্রুতিতে জগতে ঝগড়া-বিবাদ বৈ অন্য কিছুই হচ্ছে না, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে। কেবল তা-ই নয় বরং এরা ইসলামের দুর্নামের কারণ হচ্ছে। আজও মহানবী (সা.) সেভাবেই সতর্ককারী যেভাবে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে ছিলেন। পঠিত প্রথম আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّنِي لَكُمْ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ مِنْهُ। অর্থাৎ 'আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে এক সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা'।

অতএব তাঁর যুগ কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত সুসংবাদ প্রদানকারী এবং সতর্ককারী। আর আজও তিনি আপন-পর সবার জন্য সতর্ককারী। নযীর অর্থ কেবল ভয় দেখানো নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, সতর্ক করা অর্থাৎ সাবধান করা। ঐসব অপকর্ম এড়িয়ে

চলো এবং মন্দ থেকে বিরত হও। তিনি একথাই বলেছেন, আমি এক নযীর (অর্থাৎ সতর্ককারী), ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে তোমরা ইহ ও পারলৌকিক তথা উভয় জগতে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, যদিও তোমরা কলেমা পাঠকারী, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, কিন্তু যদি ধর্মের অনুশাসন পুরোপুরি মেনে না চলো তবে যা ক্ষতি হবার তা তোমাদেরও হবে। অপরদিকে যদি তোমরা এই সত্যকে অনুধাবন করো, আখারীনদের মাঝে প্রেরিত মহাপুরুষ– পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদানের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন, ইবাদতের রীতি-পদ্ধতি শিখানোর জন্য এসেছেন; তবে তোমাদের জন্য জাগতিক এবং পারলৌকিক সুসংবাদ রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের উপায় সম্বন্ধে বলেন, **'হ্যাঁ! একথা সত্য যে, মানুষ কোন পবিত্র ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে খোদাকে পাওয়ার পথ পাঁড়ি দিতে সক্ষম নয়। তাই এর বিধান কল্পে আল্লাহ্ তা'লা সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর (সা.) সত্যিকার উত্তরসূরীদের চিরস্থায়ী ধারা সূচীত করেছেন। যেভাবে এটি একটি প্রমাণিত সত্য, যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে কৃষকের সন্তান নয় সে নিড়ানি দেয়ার সময় আসল গাছকেই কেটে ফেলবে। তেমনিভাবে এই কৃষিকাজ যা রূপকঅর্থে চাষাবাদ তা পরিপূর্ণভাবে কেউ করতে সক্ষম নয় যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির অধীনে তা করা না হবে** (অর্থাৎ এমন ব্যক্তি) **যে বীজবপন, পানি সিঞ্চন এবং নিড়ানি দেয়ার সকল ধাপ দক্ষতার সাথে অতিক্রম করেছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য একজন পরিপূর্ণ মুর্শিদ (পথ প্রদর্শক) আবশ্যক। উৎকর্ষ পথপ্রদর্শক ব্যতিরেকে মানুষের ইবাদত এমনই যেন এক অবুঝ ও অজ্ঞ শিশু একটি ক্ষেতে বসে মূল বৃক্ষ কর্তন করছে অথচ মনে মনে ভাবছে যে, সে নিড়ানি দিচ্ছে। এমনটি কখনো মনে করো না যে, আপনা-আপনি ইবাদতের অভ্যাস রপ্ত হয়ে যাবে। না! যতক্ষণ রসূল না শিখাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত 'ইনকেতা ইলাল্লাহ্' অর্থাৎ জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'তাবাত্তুলে তাম' অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে খোদার হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়'।**

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। অধিকন্তু তাঁর পরিচয় লাভ করাও অসম্ভব, তখন অবশ্যই এ প্রশ্ন ওঠে, তিনি (আ.) বলেন, **'তাহলে এ সমস্যার সমাধান কোথায়? আল্লাহ্ স্বয়ং এর চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন,** অর্থাৎ এর চিকিৎসা আল্লাহ্ তা'লা কি বলেছেন? **'এর চিকিৎসা হলো ইস্তেগফার, অতএব ইস্তেগফার করো। আল্লাহ্ তা'লার রসূলের (সা.) আনুগত্য করার চেষ্টা করতঃ বিশুদ্ধচিত্তে যদি ইস্তেগফার করো এবং নিজ পাপ সমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং ভবিষ্যতে পাপ থেকে দূরে থাকার সংকল্প এবং প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখো তবেই তা সত্যিকার ইস্তেগফার বলে পরিগণিত হবে'।**

কিন্তু এটি জেনে রাখা আবশ্যক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার স্থলাভিষিক্তদের প্রেরণ করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং এরপর তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকৃত স্থলাভিষিক্তদের প্রেরণ করেছেন। এ যুগে বরং আগত সকল যুগের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত এবং খাতামুল খুলাফা। অতএব পবিত্র অন্তঃকরণে ইস্তেগফারকারী এবং ইবাদতের উন্নত মান অর্জনে সচেষ্টদের অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখাবেন; যদি তারা প্রকৃত স্থলাভিষিক্তের প্রকৃত আনুগত্যকারী হয়, তাঁর নির্দেশাবলী মান্যকারী হয় এবং যদি তাঁর প্রেরিত প্রত্যাদিষ্টকে গ্রহণ করে প্রদত্ত শিক্ষা মেনে চলে।

যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা ইস্তেগফারকে এর চিকিৎসা আখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় যে আয়াত আমি পাঠ করেছি, তাতে ইস্তেগফারের রীতি শিখানো হয়েছে, ইস্তেগফার কীভাবে করতে হবে তা বলা হয়েছে। অতএব এর অনুবাদ হলো, **এবং (আরো বলা হয়েছে) তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো (এবং) এরপর তাঁর কাছে সবিনয়ে তওবা করো। তাহলে তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন এবং প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে তার (যথাযথ) মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে নিশ্চয় আমি তোমাদের বিষয়ে এক ভয়ংকর দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি'**। অতএব আমি যেমন বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকারার্থে ইস্তেগফারকারীকে পথ প্রদর্শন করেন। এই আয়াতের প্রারম্ভে এই সত্যকে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর কাছে তাঁর সন্নিধান হতে সাহায্য চাও, তাঁর কাছে দোয়া করো যেন তিনি হৃদয়ের মরিচা ধুয়ে-মুছে তোমাদেরকে নিষ্ঠাবান বান্দায় পরিণত করেন। এরূপ করলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাহায্য করেন। কিন্তু কেউ যদি আজ একপন্থা অবলম্বন করে আবার কাল অন্যপন্থা, আর ইস্তেগফারে যদি দৃঢ়চিত্ততা না থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তা ইস্তেগফার নয়। অতএব সে সমস্ত আবেগ-অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণা যা আল্লাহ্ তা'লা অপছন্দ করেন এবং যা খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছার পথে অন্তরায় তা থেকে বিরত থাকার জন্য প্রার্থনা করাই হলো সত্যিকারের ইস্তেগফার। এই উন্নত মান যদি অর্জিত হয়, এই আবেগ সংবরণের ক্ষমতা যদি তৈরি হয় কেবল তবেই **'তুবু ইলায়হে'** (তাঁর প্রতি ঝুঁকো)-এর অবস্থা সৃষ্টি হবে। আর সেই অবস্থা সৃষ্টি হবে যখন মানুষ দৃঢ়চিত্ততার সাথে আল্লাহ্ তা'লার বিধি-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করবে। আর এমন অবস্থা সৃষ্টি হলেই বান্দা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে যায়। অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, সত্যিকারের তওবা ও ইস্তেগফার কেবল মুখ দিয়ে কিছু বাক্য উচ্চারণ বা বুলিসর্বস্ব আস্তাগফিরুল্লাহ্ আস্তাগফিরুল্লাহ্ বলাই যথেষ্ট নয় বরং সেই সাথে নিজের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করাও আবশ্যক; কেননা এটিই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের কারণ হয়। যখন মানুষ নিজের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করে তখন সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হয় আর মানুষের জন্য এতে পার্থিব ও পারলৌকিক উপকার তো রয়েছেই যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে। এই আয়াতের আলোকে ইস্তেগফার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন,

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ (সূরা হূদ: ৪) **স্মরণ রেখো! দু'টি জিনিস এই উম্মতকে দেয়া হয়েছে একটি হলো শক্তি অর্জনের জন্য, অপরটি হলো অর্জিত শক্তিকে কার্যে রূপ দেয়ার জন্য'**। অর্থাৎ একটি হলো, শক্তি ও সামর্থ অর্জন যেন সে মন্দ ও পাপ হতে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং দ্বিতীয়টি হলো, যে শক্তি অর্জিত হলো, ব্যবহারিক জীবনে যেন এর প্রতিফলন ঘটে আর মানুষের সব কথা ও কাজ যেন আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ অনুযায়ী হয়; যদ্বারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, **'শক্তি লাভের জন্য এখানে ইস্তেগফার শব্দ রয়েছে যাকে অন্যভাবে ইস্তেমদাদ ও ইস্তেআনতও বলে'**। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। ইস্তেগফারের অপর নাম হলো, আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। **'সূফীগণ লিখেছেন, শরীরচর্চা করা যেমন, মুগুর ভাজ ও দুরমুজ করার ফলে শারীরিক শক্তি ও বল বাড়ে, তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক মুগুর হলো ইস্তেগফার'**। অর্থাৎ ইস্তেগফার নিয়মিত করলে মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি হয়, এতে শক্তি লাভ হয়। তিনি (আ.) বলেন, **'এর দ্বারা আত্মা এক প্রকার শক্তি লাভ করে এবং হৃদয় দৃঢ় হয়। যদি**

কেউ শক্তি অর্জন করতে চায় সে ইস্তেগফার করুক'। অর্থাৎ যে আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করতে চায় তার বেশি বেশি ইস্তেগফার করা উচিত। **'কোন কিছু ঢাকা এবং প্রতিহত করাকে 'গফর' বলা হয়। ইস্তেগফারের মাধ্যমে মানুষ সে সকল আবেগানুভূতি ও চিন্তা-ভাবনাকে সংবরণ করার ও দমনের চেষ্টা করে যেগুলো খোদা লাভের পথে বাঁধ সাধে'**। অর্থাৎ ইস্তেগফার করতে থাকো, এর মাধ্যমে ঐসব আবেগানুভূতি ও চিন্তাধারাকে দমন করতে পারবে যা মানুষকে আল্লাহ্‌র আদেশাবলী পালনে বাঁধা দেয়। যা সৎকাজ থেকে বিরত রাখে। এর বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনের শত শত আদেশাবলী আকারে বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, **'তোমরা যদি এক আধটি নির্দেশ এবং এক আধটি পুণ্যকেও গুরুত্ব না দাও, তবে এটি পূর্ণ প্রচেষ্টা না করার নামান্তর'**। তিনি বলেন, **'অতএব ইস্তেগফারের অর্থ হচ্ছে, যে বিষাক্ত উপকরণ আক্রমন চালিয়ে মানুষকে ধ্বংস করতে চায়, তার উপর জয়ী হওয়া'**। বিষাক্ত উপাদানগুলো কি? শয়তান বিভিন্ন ভাবে আক্রমন করে থাকে, দুনিয়ার চাকচিক্য, আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী, পবিত্র কুরআনের নিষেধাজ্ঞাসমূহ অর্থাৎ যেসব কাজ করতে বারণ করা হয়েছে তা এড়িয়ে না চলা, এগুলো বিষাক্ত উপকরণ। যখন কোন মানুষ ইস্তেগফার করবে, এসব বিষাক্ত ও মন্দ উপকরণ থেকে এবং এসব পাপ থেকে সে রক্ষা পাবে আর তখনই পুণ্য পাপের উপর জয়ী হবে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, **'খোদা তা'লার নির্দেশাবলী মান্য করার পথে যত প্রকার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা থেকে আত্মরক্ষা করে সেই নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হওয়া উচিত। এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মধ্যে দু'ধরনের উপাদান রেখেছেন। একটি বিষাক্ত উপাদান যার পরিচালক শয়তান'**। অর্থাৎ এক বিষাক্ত উপকরণ রয়েছে যার উৎসাহদাতা, যার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী এবং যদ্বারা কার্যসিদ্ধি করে শয়তান। **'আর অন্যটি হচ্ছে, প্রতিষেধক'**। অর্থাৎ আরোগ্যের উপকরণ, যদ্বারা পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। তিনি (আ.) বলেন, **'যখন মানুষ অহংকার করে এবং মনে করে যে, আমি কিছু একটা হনুরে এবং প্রতিষেধক মূলক ঝর্ণাধারা থেকে সাহায্য নেয় না, তখন বিষাক্ত উপকরণ তার উপর ছেয়ে যায়'**। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে বিষ ও প্রতিষেধক এই উভয় উপাদান বিদ্যমান, ভালমন্দ উভয়টি বিদ্যমান। যদি ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত না করো পুণ্যের মাধ্যমে পাপকে প্রতিহত না করো, আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর 'গুফরান' (অশেষ ক্ষমা) বৈশিষ্ট্যের আশ্রয়ে না আসো তবে ঐসব পাপাচারিতা তোমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। যদি ইস্তেগফার না করা হয় তাহলে হৃদয় অহংকারে ভরে যায় যা ইস্তেগফারের পথে বাঁধ সাধে। প্রতিষেধক মূলক ঝর্ণা যা কিনা ইস্তেগফার তা যদি কাজে লাগানো না হয় তাহলে মানুষের মাঝে বিষাক্ত উপকরণ বা অপশক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। তিনি (আ.) বলেন, **'কিন্তু মানুষ যদি নিজেকে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং নিজের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হয়। যারফলে তার আত্মা বিগলিত হয়ে প্রবাহিত হয় আর এরই নাম ইস্তেগফার'**।

অতএব এই আত্মার বিগলন বা সত্যিকার ইস্তেগফার কি? তাহলো, এমন ইস্তেগফার যদ্বারা আত্মা বিগলিত হয়ে অশ্রুধারার আকারে ঝরতে থাকে। আত্মার এ বিগলন বুলিসর্বস্ব ইস্তেগফার নয়, বরং হৃদয় থেকে উৎসারিত পরম আবেগের সাথে ইস্তেগফার করা উচিত। এমন ইস্তেগফার যদি করা হয় এবং খোদা তা'লার সমীপে যদি তা অশ্রুজলের ন্যায় প্রবাহিত হয়, তাহলে তা একজন মানুষের মধ্যে বিপ্লব সাধন করে এবং এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে।

তিনি (আ.) বলেন, **'তখন সে বিষাক্ত উপাদান সমূহের উপর জয়ী হয়'**। অর্থাৎ যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, ইস্তেগফারের মাধ্যমে শক্তি লাভ হয়। ঐ ইস্তেগফার থেকে শক্তি অর্জিত হয় যা আন্তরিক আবেগের সাথে নির্গত হয় এবং যা অশ্রুজলের ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকে। এ ইস্তেগফার হল, প্রকৃত ইস্তেগফার যা মানুষের মধ্যে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে।

তিনি (আ.) বলেন,**'বস্তুত এর অর্থ হচ্ছে, ইবাদতের উপর এভাবে প্রতিষ্ঠিত হও, প্রথমতঃ রসূলের আনুগত্য কর দ্বিতীয়তঃ সর্বদা খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো'**। তিনি (আ.) বলেন, **'হ্যাঁ, প্রথমে নিজ প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো। যখন** (তাঁর নিকট থেকে) **শক্তি লাভ হয় তখন 'তুবু ইলাইহে' অর্থাৎ খোদা তা'লার প্রতি প্রত্যাবর্তন করো'**।

আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে রসূলের আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর প্রতি বিনত হয়ে রসূলের আনুগত্য করতে হবে। আর মানুষ যদি স্থায়ীভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনত থাকে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে তবেই সে অবস্থা সৃষ্টি হবে যাকে "তুবু ইলাইহে"র অবস্থা বলা হয়। যাতে আল্লাহ্ তা'লা অনুশোচনা গ্রহণ করে তাকে মন্দ থেকে দূরে রাখেন।

তিনি এক জায়গায় 'তুবু ইলাইহে'র বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, **'ইস্তেগফার ও তওবা দু'টি ভিন্ন জিনিস। একটি কারণে ইস্তেগফার তওবার চেয়ে অগ্রগণ্য'**। অর্থাৎ ইস্তেগফার তওবার চেয়ে আগে এবং গুরুত্বপূর্ণ। **'কেননা, সাহায্য ও শক্তি লাভের নাম ইস্তেগফার– যা খোদার কাছ থেকে লাভ হয়। আর তওবা হচ্ছে নিজের পায়ে দাঁড়ানো'**। অর্থাৎ ইস্তেগফার প্রথমে, এর দ্বারা সাহায্য ও শক্তি মিলে, সামর্থ লাভ হয়। এ জন্য আল্লাহ্ তা'লার সমীপে অশ্রু প্রবাহিত করা হয়। যখন তওবা ও ইস্তেগফার করা হয় তখন হৃদয়কে সর্ব প্রকার কলুষতা থেকে মুক্ত রাখা উচিত। এজন্য এটি প্রথমে রাখা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করো। আর যখন এটি লাভ হয় তখন মানুষের দ্বিতীয় প্রদক্ষেপ হবে তওবা, অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। এরপর তওবার বেলায়ও অনবরত ইস্তেগফার করে তওবার সংরক্ষণ করতে হবে। যেভাবে আজকাল বিভিন্ন স্থানে কানে হাত দিয়ে তওবা তওবা বলার প্রচলন আছে এটি আদৌ তওবা নয়। বরং প্রথমে ইস্তেগফারের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করো। তারপর সেই মর্যাদায় উপনীত হও যেখানে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জিত হয়, পুণ্যের প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। এমনটি করলেই তওবা হবে আর যখন তা অর্জিত হবে, তখন একে ধরে রাখার জন্য পুনরায় ইস্তেগফার আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, **'এটিই আল্লাহ্‌র বিধান, যখন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন খোদা তা'লা একটি শক্তি দান করবেন। এরফলে এই সময়ের পর মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে আর পুণ্যকর্ম করার জন্য তার মাঝে একটি শক্তি সৃষ্টি হবে যার নাম 'তুবু ইলাইহে'। তাই এটি একটি স্বাভাবিক ধারাবিন্যাস। মূলতঃ এতে পুণ্যের পথযাত্রীদের জন্য একটি রীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, অর্থাৎ পুণ্যের পথযাত্রী সর্বাবস্থায় খোদা তা'লার সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করে। আধ্যাত্মিক জগতের পথযাত্রীরা যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লার পক্ষ থেকে শক্তি লাভ না করবে তারা কিই-বা করতে পারবে। তওবার সামর্থ ইস্তেগফারের মাধ্যমেই লাভ হয়। যদি ইস্তেগফারই না থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, তওবার শক্তি লোপ পায়। যদি এভাবে ইস্তেগফার করো এবং তওবা করে থাকো তাহলে এর ফলাফল দাঁড়াবে,** يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى **অর্থাৎ তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন'** (সূরা হূদ: ৪)।

তিনি (আ.) বলেন, **'আদি থেকে এটিই আল্লাহ্ তা'লার রীতি, যদি ইস্তেগফার এবং তওবা করো তাহলে তুমি তোমার জন্য নির্ধারিত পদমর্যাদায় উন্নীত হতে পারবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উন্নতির একটি নির্ধারিত গন্ডি বা পরিধি আছে, যে গন্ডি বা পরিধির মাঝে সে উন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে থাকে'**। অর্থাৎ কোন কিছু অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বা কোন কিছু আবিষ্কারের যোগ্যতা, কোন কিছু পাওয়ার শক্তি ইত্যাদির একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী এক গন্ডি বা পরিধির মাঝে প্রত্যেক মানুষ নিজের উন্নতির সোপান অতিক্রম করে থাকে।

তিনি (আ.) বলেন, **'প্রত্যেক ব্যক্তিই নবী, রসূল, সিদ্দিক ও শহীদ হতে পারে না'**। এটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক কথা কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, **'এতেও সন্দেহ নেই যে, মর্যাদার ক্ষেত্রে একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব থাকতেই পারে'**। এটিও একেবারে ঠিক যে, সবাই প্রত্যেক স্তরে ও মানে পৌঁছতে পারে না আর মর্যাদার ক্ষেত্রে কারো শ্রেষ্ঠ হওয়া সুবিদিত বিষয়। **'এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এসব বিষয়ের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকলে অধ্যাত্মিক জগতের প্রত্যেক পথযাত্রী নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী পদমর্যাদা লাভ করবে'**। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যে সকল কাজ করতে বলেছেন তা যদি প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ সামর্থ ও শক্তি অনুযায়ী অবিচল ভাবে করতে থাকে, আল্লাহ্‌কে পাবার জন্য মুআযাবাত বা স্থায়ীভাবে অবিচলতার সাথে চেষ্টা অব্যাহত রাখে তাহলে পেয়ে যাবে। আর এটিই وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ আয়াতের অর্থ। অর্থাৎ প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে তার যথাযথ মর্যাদা দান করবেন। আর যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এ যুগেও প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্মীয় কল্যাণে ভূষিত হন, এ যুগেও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হয় আর শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে পরকালেও লাভ হবে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **'কিন্তু কেউ যদি অধিক পরিশ্রম করে তাহলে পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তিনি তাকে বাড়তি দানে ভূষিত করবেন'**। অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ধারাও পাশাপাশি কাজ করছে তাই কাকে কতটা দিবেন তা তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করে, আল্লাহ্ তা'লা নিজ অপার অনুগ্রহে যদি অঢেল দিতে চান তাহলে তাও তার তওবা, ইস্তেগফার ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেই হবে। তিনি (আ.) বলেন, **'সে তার বর্ধিত ফলাফল লাভ করবে যা স্বভাবতঃই তার অধিকার। যিল ফাজলিন-এর সম্পর্ক মালিক-এর সাথে আর এর অর্থ হলো, খোদা তা'লা কাউকে বঞ্চিত রাখবেন না'**। অর্থাৎ এটি আল্লাহ্ তা'লার নিজ কৃপা কেননা তিনি মালিক এবং শক্তিশালীও, তাঁর অপার কৃপাগুণে এটি হচ্ছে, শুধু পরিশ্রমের ফসল নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা মালিক হবার সুবাদে নিজ অনুগ্রহকে যত ইচ্ছা বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। আর তাঁর স্থায়ী রীতি এটিই যে, তিনি ইস্তেগফারকারীদের, তাঁর পানে অগ্রসরমানদের এবং সচেষ্টদের অপার অনুগ্রহে ভূষিত করে থাকেন।

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **'কিছু মানুষ এভাবে বলে থাকেন, মিয়াঁ আমাকে ওলী হতে হবে? যে এমন বলে সে দুনিয়ার কীট এবং কাফির।** (অর্থাৎ নীচ ও কাফির)। **মানুষের উচিত প্রকৃতির নিয়মকে নিজের অনুকূলে এনে কাজ করা। আল্লাহ্ তা'লাও এক বিধান বানিয়ে রেখেছেন। ইস্তেগফার এবং তওবার দরজা খোলা রেখেছেন। একে ব্যবহার করা উচিত আর যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। নিজের সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। বাকী আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ। তিনি প্রত্যেককে তথা সকলকে তার মর্যাদা অনুযায়ী, তার সামর্থ অনুযায়ী দিয়ে থাকেন'**।

এতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানগর্ভ এবং আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত যে সকল আলোচনা হচ্ছিল এর সাথে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মজলিসের বা বৈঠকের কিছু কথা এখন বর্ণনা করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সভা বা বৈঠকে মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতো। এমনই এক সভায় ইস্তেগফারের গুরুত্ব তিনি (আ.) কীভাবে স্পষ্ট করেছেন এ সম্পর্কে একটি বর্ণনায় এসেছে, একজন জিজ্ঞেস করলেন আমি কী ওযীফা বা দোয়া পড়বো? সে যুগেও মানুষের ভেতর ওযীফা পড়ার রীতি ছিল এবং প্রবল আগ্রহ ছিল এবং এখনও আছে, তিনি (আ.) বলেন, **'অনেক বেশি ইস্তেগফার পাঠ করো। মানুষের অবস্থা দু'টিই, পাপ পরিহার করা অথবা** (পাপ হয়ে গেলে) **আল্লাহ্ তা'লা সেই পাপের মন্দ পরিণাম থেকে যেন রক্ষা করেন** (এই দোয়া করা)'। অর্থাৎ মানুষের দু'টি অবস্থা হয়ে থাকে, পাপ মুক্ত থাকা আর যদি পাপ সংঘটিত হয়েও যায় এবং সে নিজের ভুল বুঝতে পারে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা পাপের মন্দ পরিণাম থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। তিনি (আ.) বলেন যে, **'শতবার ইস্তেগফার পড়ার সময় দু'টি অর্থই দৃষ্টিতে রাখা উচিত'**। অর্থাৎ ইস্তেগফার পাঠের সময় দু'টি অর্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখো। এটি অনেক বড় ওযীফা যে, প্রথমতঃ মানুষ পাপ না করে, গুনাহ্ থেকে রক্ষার জন্য দোয়া করে আর যদি গুনাহ্ হয়েই যায় তাহলে তার মন্দ পরিণাম যেন প্রকাশিত না হয়। তিনি (আ.) বলেন, **'প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লার নিকট ঘটে যাওয়া পাপকে ঢেকে রাখার জন্য দোয়া করা আর দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে পাপ থেকে রক্ষার জন্য খোদার সাহায্য চাওয়া কিন্তু ইস্তেগফার শুধুমাত্র বুলী সর্বস্ব হলে চলবে না বরং হৃদয় থেকে উৎসারিত হতে হবে। নামাযের মধ্যে মাতৃভাষায় দোয়া করো, এটি খুবই জরুরী'**।

কাজেই পাপ মুক্তি এবং গুনাহ্ থেকে বাঁচানোই হলো ইস্তেগফারের মূল উদ্দেশ্য। পাপের বিবরণ জানার জন্য পবিত্র কুরআনের আদেশ নিষেধের প্রতি গভীর অভিনিবেশ করা প্রয়োজন।

এরপর একটি বৈঠকে একজন আসেন, সেখানে মৌলভী আব্দুল করীম (রা.)'ও বসে ছিলেন, পূর্ব পরিচিত ছিল বলে তাঁর সাথে এসে সাক্ষাত করেন। তিনি তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খিদমতে হাজির করে বলেন, **'এই ব্যক্তি অনেক পীর, ফকীরের কাছে ও বিভিন্ন দরবারে ধর্ণা দিয়েছেন। বড় বড় মাশায়েখের সান্নিধ্য পেয়েছেন আর এখন তিনি এখানে এসেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বললেন, কী বলতে চান বলুন? তিনি বলতে লাগলেন, হুযূর! আমি অনেক পীরের কাছে গিয়েছি, আমার ভেতর কিছু দোষত্রুটি আছে, প্রথমতঃ আমি যেসব বুযূর্গদের কাছে গিয়েছি কিছুদিন তাদের কাছে থেকে চলে আসি কেননা তাদের প্রতি হৃদয়ে বীতশ্রদ্ধতা জন্মাতো। দ্বিতীয়তঃ আমার মধ্যে পরচর্চা করার বদভ্যাস রয়েছে। তৃতীয়তঃ ইবাদতে মন বসে না, এছাড়া আরও অনেক ত্রুটি রয়েছে'**। হযরত আকদাস (আ.) বলেন, **'আমি বুঝেছি, তোমার আসল রোগ হচ্ছে অধৈর্য, অন্যগুলো এর উপসর্গ মাত্র'**। অর্থাৎ তোমার আসল রোগ হচ্ছে ধৈর্যহীনতা বাকী গুলো এর সহযোগী ব্যাধি। **'দেখো! মানুষ নিজের পার্থিব বিষয়াদিতে অধৈর্য হয় না বরং ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে পরিণামের জন্য অপেক্ষা করে; তাহলে খোদার বেলায় কেন অধৈর্য প্রদর্শন করে। একজন কৃষক যেদিন জমিতে বীজ বপন করে সেদিনই ফসল কাটার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে কী? অথবা একটি সন্তানের জন্ম হতেই বলে কি যে যুবক হয়ে সে আমায় সাহায্য করুক— একথা কেউ বলে কী ? খোদা তা'লার প্রকৃতিতে এ ধরনের তাড়াহুড়ো ও ত্বরাপরায়ণতার কোন দৃষ্টান্ত নেই। সে বড়ই নির্বোধ যে এ ধরনের তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে চায়। সেই ব্যক্তিকেও স্বয়ং নিজেকে ভাগ্যবান মনে করা উচিত যে নিজের দোষকে— দোষ হিসেবে অনুধাবন করতে পারে। সে ব্যক্তি বড় ভাগ্যবান যে নিজের ভেতরের নোংরামী ও ত্রুটি দেখতে পায় নতুবা**

শয়তান মন্দ ও অপকর্মগুলোকে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেখায়'। যদি মানুষের চৈতন্যদয় ঘটে যে, আমার মাঝে এই মন্দ সমূহ রয়েছে তাহলে এটি একটি ভাল গুণ; কেননা শয়তান নিজের কাজ করে যাচ্ছে আর সে মন্দকর্ম সমূহকেও সুন্দরভাবে প্রদর্শন করে। তিনি (আ.) বলেন, **'অতএব তুমি নিজের অধৈর্যকে পরিত্যাগ করে ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে খোদা তা'লার নিকট সামর্থ চাও আর নিজের পাপ সমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। তার জন্য কিছু করা সম্ভব নয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রেমীর কাছে এ উদ্দেশ্যে আসে যে, তিনি ফুঁ দিয়ে তার সংশোধন করবেন; সে খোদার উপর খোদকারি করতে চায়। এখানে অনুগত দাস বনে আসা উচিত। সকল ক্ষমতা বিসর্জন দেয়া ছাড়া কোন কাজই হবে না। রোগী যখন ডাক্তারের কাছে যায় তখন বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে। মানুষ ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিজের অসুস্থতার কথা বলে কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার বুঝে যে, আসলে তার অমুক ব্যাধি রয়েছে। তিনি তার চিকিৎসা আরম্ভ করে দেন। তদ্রুপ তোমার রোগ হচ্ছে অধৈর্য! তুমি যদি এর চিকিৎসা করাও তাহলে খোদা চাইলে অন্যান্য রোগও দূরীভূত হয়ে যাবে। আমাদের নীতি হলো, যতক্ষণ জীবনের শেষ মুহূর্ত এসে না যায় মানুষের চাইতে থাকা উচিত এবং খোদা তা'লার ব্যাপারে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার অন্বেষা ও ধৈর্য এ পর্যায়ে উপনীত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সফল হতে পারবে না'**।

অতএব জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবার নাম হলো ধৈর্য। তিনি (আ.) বলেন, **'খোদা তা'লা সর্ব শক্তিমান! তিনি চাইলে নিমিষেই সফলকাম করতে পারেন, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াও আবশ্যক নয়। আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান, তিনি চাইলে প্রথমবারের দোয়াতেই বা এক সিজদার পরই দোয়া কবুল করতে পারেন। কিন্তু সত্যিকার প্রেমিকের পরিচয় হলো, সে যেন অন্বেষণের পথে চলতে থাকে অর্থাৎ সে যেন একনিষ্ঠভাবে দৌঁড়াতে থাকে ও চলতে থাকে। শেখ সাদী ফার্সী পঙ্কতিতে বলেছেন,**

'গার নবায়েদ বদূঁ ইসতরাহ্ বরদন
শরতে ইশকাসত দর তলবে মরদন'

অর্থাৎ বন্ধুর কাছে পৌঁছানো অসম্ভব হলে ভালবাসার মৌলিক শর্ত হলো, তাকে পাবার চেষ্টায় মৃত্যু বরণ করা'। তাকে পাবার জন্য এবং তাকে পাবার আকাংখা নিয় মৃত্যু বরণ করা।

তিনি (আ.) বলেন, **'ব্যাধি দু'প্রকার হয়ে থাকে। একটি হলো "মুস্তাবী" ব্যাধি আরেকটি হলো "মুখতালাফ" ব্যাধি। "মুস্তাবী" হলো সেই ব্যাধি যাতে ব্যথা-বেদনা অনুভূত হয়। ব্যাথা বেশী হলে, অসুখ বেড়ে গেলে এবং ব্যাধি প্রকাশ পেলে এমন রোগকে মুস্তাবী ব্যাধি বলে। এমন রোগের চিকিৎসা করার ব্যাপারে মানুষ উদ্বিগ্ন হয়। কিন্তু মুখতালাফ ব্যাধির ব্যাপারে মানুষ কোন চিন্তাই করে না'**। অর্থাৎ কতক অপ্রকাশিত ব্যাধি আছে যা অনুভূত হয় না ফলে মানুষ সেগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। **'অনুরূপভাবে কতক পাপ রয়েছে যা অনুভূত হয় আবার এমনও কতক পাপ আছে যা মানুষ অনুভবও করে না। কাজেই মানুষের উচিত সর্বদা খোদা তা'লার নিকট ইস্তেগফার করতে থাকা। খোদা তা'লা (মানবজাতির) সংশোধনের জন্য পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যদি ফুঁ দিয়ে সংশোধন করাই খোদা তা'লার রীতি হতো তাহলে কেন খোদার নবী (সা.) মক্কায় তেরটি বছর দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। আবু জাহল গংদেরকে কেন প্রভাবিত করেন নি? দোয়ার ফলাফল দ্রুত প্রকাশ পায়। আবু জাহলের কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু আবু তালেব তো তাঁকে (সা.) ভালবাসতো। অর্থাৎ রসূল করীম (সা.)-এর প্রতি আবু তালেবের ভালবাসা ছিল কিন্তু তা**

সত্ত্বেও তিনি মুসলমান হন নি। কাজেই ধৈর্যহীনতার ফল কখনোই ভালো হয় না বরং পরিণামে তা ধ্বংস পর্যন্ত উপনীত করে'।

একবার তাঁর (আ.) বৈঠকে ঋণ মুক্তির জন্য একজন দোয়ার আবেদন করেন। হুযূর (আ.) বলেন, **'সেই ব্যক্তি বলে আমি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছি এর প্রতিউত্তরে হুযূর (আ.) বলেন, অনেক বেশি ইস্তেগফার করুন। মানুষের জন্য দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে, ইস্তেগফার।** অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচার ও তা দূর করার উপায় হচ্ছে ইস্তেগফার করা। অর্থাৎ দুঃখ লাঘব করার জন্য ইস্তেগফার করা উচিত। **'ইস্তেগফার হচেছ উন্নতির চাবিকাঠি। অর্থাৎ তোমার সফলতার চাবি ইস্তেগফারের মাঝে নিহিত'**। কাজেই স্মরণ রাখা উচিত, ইস্তেগফারের ফলে সফলতার তালা কেবল তখনই খুলবে যখন সেই ইস্তেগফার করা হবে যার উল্লেখ আমি পূর্বে করে এসেছি। অর্থাৎ কীভাবে মানুষকে নিষ্ঠার সাথে খোদার দরবারে সমর্পণ করা উচিত।

এক ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে অর্থাৎ আমার জন্য দোয়া করুন যেন আমার সন্তান হয় এর প্রেক্ষিতে তিনি (আ.) বলেন, **'অনেক বেশি ইস্তেগফার করুন, এরফলে পাপও মোচন হয় আর আল্লাহ্ তা'লা সন্তান-সন্ততিও দান করেন। মনে রেখো! বিশ্বাস অনেক বড় বিষয়। অর্থাৎ ইস্তেগফার করার সময় খোদা তা'লার প্রতিও পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। যে ব্যক্তি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ খোদা তা'লা স্বয়ং তাঁকে সাহায্য করেন'**।

কোন এক সময় তিনি (আ.) বলেন, **'দুর্বলতা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত। পাপের শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য ইস্তেগফার এমনই ভূমিকা রাখে যেভাবে একজন বন্দী জরিমানা দিয়ে নিজেকে বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে নেয়'**।

একবার তিনি (আ.) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, **'কতক মানুষ দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত থাকে আর তা তাদের নিজেদের কর্মফলেই হয়।** مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (অর্থ: আর যে এক অণু পরিমাণও মন্দ কাজ করেছে সে তা দেখতে পাবে। সূরা আয্ যিল্যাল:৯) **অতএব মানুষের জন্য সর্বদা তওবা এবং ইস্তেগফারে রত থাকা আবশ্যক। আর পর্যবেক্ষণ করতে থাকো যাতে এমন যেন না হয়, মন্দকর্ম সমূহ সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং পরিণামে তা খোদা তা'লার শাস্তিকে ডেকে আনে। যখন খোদা তা'লা কারো প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেন তখন সাধারণত** (মানুষের) **হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালবাসার উদ্রেক করে দেন'**। অর্থাৎ যখন কারো প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বর্ষিত হয় তখন মানুষের হৃদয়েও তার জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। **'কিন্তু যখন যুগের লোকদের অনিষ্ট সীমাতিক্রম করে তখন আকাশে তার বিরোধিতার সংকল্প হতেই আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছানুযায়ী মানুষের হৃদয় কঠিন হয়ে যেতে থাকে'**। অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি না দেয়ার সিদ্ধান্ত করেন তখন মানুষের হৃদয়ও তার ব্যাপারে কঠিন হয়ে যায়। **'কিন্তু যখনই সে তওবা এবং ইস্তেগফারের সাথে খোদা তা'লার দরবারে সমর্পিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে তখন ভেতরে ভেতরে এক প্রকার দয়ার উদ্রেক হতে থাকে এবং কেউ বুঝতেও পারে না যে, তার প্রতি ভালবাসার বীজ মানুষের হৃদয়ে বপন করে দেয়া হয়েছে'**। অর্থাৎ যখন মানুষের হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয় না আর তার ব্যাপারে যদি আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেতে থাকে তখন মানুষের হৃদয় তার প্রতি কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে ইস্তেগফার করে, তওবা করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার ইস্তেগফার, তওবা গ্রহণ করেন আর এর ফলশ্রুতিতে মানুষের হৃদয়ে তার জন্য দয়া ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। তিনি (আ.) বলেন, **'তার প্রতি ভালবাসার বীজ মানুষের হৃদয়ে বপন করে দেয়া**

হয়। মোটকথা তওবা এবং ইস্তেগফার এমন একটি পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র যা কখনোই বিফলে যায় না'।

বর্তমানে এই পার্থিবতার পূজারীদের মন্দকর্ম সমূহের কারণেই বিভিন্ন দেশে নৈরাজ্য এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে। এসব নেতা যারা নিজেদের ধারণানুসারে নিজেদেরকে জনগণের হিতাকাঙ্খী মনে করতো, যারা নিজেদের ধারণানুসারে এখনও নিজেদের মর্যাদা ও অবস্থান ধরে রেখেছে অথচ সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এখনও তাদের মনে এটিই বদ্ধমূল ধারণা, আমরা জনগণের অনেক প্রিয়, জনতা আমাদের অনেক পছন্দ করে, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তাদেরও দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। মোটকথা পৃথিবীতে একটি নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে এরফলে যেসব স্থানে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তিত হয়েছে তারা অধিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এছাড়া ভবিষ্যতে আরো কত যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির আগুন অপেক্ষা করছে তা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। এজন্য আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা করেন।

অতএব ইস্তেগফার যেখানে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের উদ্দ্যেশ্যকে পূর্ণ করে, আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করে। আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত প্রতিনিধির সাথে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম হয় অনুরূপভাবে যুগের বিশৃঙ্খলা এবং আল্লাহ্ তা'লার অসন্তোষ থেকেও মানুষকে রক্ষা করে। সে পথে পরিচালিত করে যা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের মাধ্যম, যারফলে ইহ ও পরকাল নিশ্চিত হয়। অনুরূপভাবে মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানো এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবারও মাধ্যম হয়ে থাকে, যেভাবে অনেকগুলো ঘটনা আমি বর্ণনা করেছি যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উপদেশ দিয়েছেন, ইস্তেগফার এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ ও রহমতের উত্তরাধিকারী হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আহমদীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাই আমরা এ যুগের ইমামকে মেনেছি যিনি আমাদেরকে ইবাদত, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এথেকে কল্যাণ লাভ করার জন্য আমাদেরকে সর্বদা ইস্তেগফার করা প্রয়োজন, যা প্রত্যেক আহমদীকে রক্ষাকবচ হিসেবে অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সামর্থ দান করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)